ইসলামি দাওয়াতের পথ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলামি দাওয়াতের পথ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

সংকলন ও অনুবাদ

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

ইসলামি দাওয়াতের পথ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

সংকলন ও অনুবাদ

আবদুস শহীদ নাসিম

শ.প্র. : ৪৯

ISBN : 984-645-018-4

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা- ১২১৭

ফোন: ৮৩১৭৪১০, মোবাইল: ০১৭৫৩৪২২২৯৬

ই-মেইল: shotabdipro@yahoo.com

প্রকাশকাল

চতুর্থ মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৩ ঈসায়ী

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১

কম্পোজ : মুর্তজা হাসান খালেদ

Saamra Computer

মুদ্রণ

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ২৫.০০ টাকা মাত্র

ISLAMI DAWATER POTH by Sayyed Abul A'la Maudoodi, Compiled & Translated by Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone: 8317410, Mob:01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com. First Edition: 1991, Fourth print: August 2013.

Price TK. 25.00 Only

আমাদের কথা

বিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বিজ্ঞান চরম উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করেছে। কিন্তু এই উন্নতি মানুষকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, যেসব মতবাদের ভিতের উপর আধুনিক সভ্যতা ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলো মানবতাবোধের সহায়ক নয়। যক্ষ্মার জীবাণুর মতো মানব সভ্যতার প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে এই মতবাদগুলো।

তাই বিশ্বমানবতা আজ হন্যে হয়ে ঘুরে ফিরছে একটি বিশ্বজনীন পুণ্যময় কল্যাণধর্মী জীবনাদর্শের খোঁজে। নিঃসন্দেহে সে জীবনাদর্শ ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু নয়। মানবতার কল্যাণাকাংখী যে কোনো সত্যসন্ধানী বিশ্বশান্তি ও মানবতার কল্যাণের জন্যে ইসলামি জীবনাদর্শকেই বেছে নেবেন নিঃসন্দেহে।

ইসলামের আহ্বান কি? কোন্ সব নীতি ও আদর্শের দিকে সে মানব সমাজকে আহ্বান জানায়? এ পুস্তিকায় যুক্তির কষ্টিপাথরে তাই বর্ণিত হয়েছে। সাথে সাথে তুলে ধরা হয়েছে পশ্চিমা সভ্যতার কুৎসিত চেহারা। সব মিলিয়ে সত্যসন্ধানী পাঠকদের জন্যে এটি একটি চমৎকার পুস্তিকা। সত্য সমুদ্ভাসিত হোক আর বিনাশ হোক মিথ্যা বাতিলের।

আবদুস শহীদ নাসিম
০৯ জুলাই ১৯৯১ ঈসায়ী

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১

পশ্চিমা সভ্যতার বিনাশী ভিত[1]

আমি চাই, আপনারা প্রথমে একথা ভালো ভাবে জেনে নিন যে, আমরা কোন্‌সব ভ্রান্ত মতবাদ ও নীতিমালাকে অপসারণ করে সে স্থলে ইসলামের পুণ্যময় কল্যাণধর্মী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চাই? তারপরই ইসলামি দাওয়াতের পথ ও পাথেয় আলোচনা করবো।

পশ্চিমা সভ্যতার তিন পিলার

যে আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিতে বর্তমান বিশ্বের গোটা দার্শনিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে, তা আসলে তিনটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত :

১. Secularism অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীন জাগতিকতা,
২. Nationalism অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ বা জাতি পূজা,
৩. Democracy অর্থাৎ জনগণের শাসন বা জনগণের সার্বভৌমত্ব।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

এর মধ্যে পয়লা মতবাদ ধর্মনিরপেক্ষতার সারকথা হলোঃ "আল্লাহ, তাঁর বিধান এবং তাঁর ইবাদতের বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনের এ ক্ষুদ্র গণ্ডিটি ছাড়া অন্য সকল জাগতিক বিষয় আমরা ঠিক সেভাবে পরিচালিত করবো, নিরেট বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যেটাকে সঠিক বলে মনে করবো। এসব ব্যাপারে আল্লাহ

---

১. এটি ১৯৪৭ সালের ৯ মে পূর্ব পাঞ্জাবস্থ পাঠানকোটের 'দারুল ইসলামে' প্রদত্ত লেখকের ভাষণ।

কি বলেন? তাঁর বিধান কি? এবং তাঁর কিতাবে কি লেখা আছে? - এ প্রশ্নগুলো আলোচনার গণ্ডিতেই আসতে পারবে না।"

পাশ্চাত্যবাসী তাদের পায়ের বেড়িতুল্য খৃষ্টান পাদ্রীদের সেই স্বরচিত ধর্মের (theology) প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েই প্রথম প্রথম এ কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এ কর্মনীতি একটি স্বতন্ত্র জীবন দর্শনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং আধুনিক সভ্যতার পয়লা ভিত্তিপ্রস্তর বলে স্বীকৃত হয়। আপনারা প্রায়ই একথাটি শুনে থাকবেন: "ধর্ম আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত চুক্তি।" এই ক্ষুদ্র বাক্যটিই আসলে আধুনিক সভ্যতার 'কলেমা'।

এর ব্যাখ্যা হলো, কারো মন যদি সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ আছেন এবং তাঁর ইবাদত অর্চনা করা উচিত, তবে সে তার ব্যক্তিগত জীবনে খুশি মতো নিজে আল্লাহ্‌র ইবাদত অর্চনা করতে পারে। কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে আল্লাহ এবং ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।

এই 'কলেমা'র (মূলমন্ত্রের) ভিত্তিতে যে জীবন ব্যবস্থার ইমারত নির্মিত হয়েছে, তাতে মানুষে মানুষে সম্পর্কের এবং মানুষ ও জগতের মাঝে সম্পর্কের সকল পন্থা আল্লাহ ও ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন। সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক তা থেকে স্বাধীন। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তা থেকে মুক্ত। আইন ও পার্লামেন্ট তা থেকে মুক্ত। রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন তা থেকে মুক্ত। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নিয়মনীতি তা থেকে মুক্ত।

এমনি করে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সব কিছু নিজেদের জ্ঞান ও খুশি মতো পরিচালিত করা হয়। এই সকল বিষয়ে আল্লাহ আমাদের জন্যে কোনো মূলনীতি ও বিধি বিধান দিয়েছেন কিনা? এ প্রশ্নকে কেবল বিবেচনার অযোগ্যই নয়, বরঞ্চ ভ্রান্ত এবং চরম অজ্ঞতা ও অন্ধতা মনে করা হয়।

এবার আসা যাক ব্যক্তি জীবনের কথায়। তাও ধর্মবিবর্জিত শিক্ষা এবং ধর্মহীন সমাজের বদৌলতে অধিকাংশ ব্যক্তির জীবনই নিরেট

সেক্যুলার জীবনে পরিণত হয়। কারণ, এরকম সমাজ ব্যবস্থায় খুব কম লোকের মন ও বিবেকই 'আল্লাহ্ আছেন এবং তাঁর ইবাদত অর্চনা করা উচিত' বলে সায় দেয়। বিশেষ করে যারা সমাজের মূল কর্ণধার ও কর্মী, তাদের কাছে তো ধর্ম আর ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবেও অবশিষ্ট থাকেনা। আল্লাহ্‌র সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়।

জাতীয়তাবাদ

পশ্চিমা সমাজ দ্বিতীয় যে জিনিসটির উপর ভর করে আছে, তা হলো জাতীয়তাবাদ বা জাতি পূজা! জাতি পূজার সূচনা হয় পোপ ও কাইজারের স্বৈরতান্ত্রিক অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে। এর সারকথা ছিলো, বিভিন্ন জাতি নিজেদের রাজনীতি ও কল্যাণ চিন্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনো সাম্রাজ্যবাদী আত্মিক ও রাজনৈতিক শক্তির হাতে তারা দাবার গুটির মতো ব্যবহৃত হবেনা।

এই নিষ্পাপ সূচনা থেকে যখন এই ধ্যান ধারণা সামনে অগ্রসর হলো, তখন ক্রমশ জাতি পূজা জাতীয়তাবাদকে ঠিক সে স্থানে নিয়ে বসিয়ে দিলো, ধর্মহীনতার (secularism) আন্দোলন যেখান থেকে খোদাকে উচ্ছেদ করেছিল।

এখন প্রত্যেক জাতির শ্রেষ্ঠতম নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে তার জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয় উচ্চাকাংখা (aspirations)। জাতির জন্যে যেটা কল্যাণকর সেটাই পুণ্যের কাজ, চাই তা মিথ্যা হোক, বেঈমানি হোক, কিংবা অপরের অধিকার হরণ হোক, কিংবা হোক সেরকম কোনো কাজ, যা পুরানো (!) ধর্ম ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে চরম অপরাধ।

অন্যদিকে পাপ মনে করা হয় সে কাজকে, যা জাতীয় স্বার্থের জন্যে ক্ষতিকর, চাই তা সত্য হোক, ন্যায় ও সুবিচার হোক, প্রতিশ্রুতি রক্ষা হোক, অধিকার প্রদান করা হোক, কিংবা হোক সে ধরনের কোনো কাজ, যেগুলোকে সৎ গুণাবলির মধ্যে গণ্য করা হয়।

জাতির লোকদের সৌন্দর্য এবং জাগরণ ও সচেতনতার মাপকাঠি হলো, তাদের কাছে জাতীয় স্বার্থে যে ত্যাগ ও কুরবানিই দাবি করা হোক না কেন, তাতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবেনা, চাই তা জানমালের কুরবানি হোক, সময়ের কুরবানি হোক, বিবেক ও ঈমানের কুরবানি হোক, চরিত্র ও মানবতার কুরবানি হোক, কিংবা হোক আত্মসম্মানের কুরবানি। এসব কুরবানির ক্ষেত্রে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত তো হবেই না, বরং ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে জাতির অগ্রসরমান উচ্চাকাংখাকে পূর্ণ করার কাজে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আত্মনিয়োগ করবে। এ ধরনের ত্যাগী লোকদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে অপর জাতির উপর নিজ জাতির পতাকা উড্ডীন করাই এখন প্রত্যেক জাতির জাতীয় সাধনায় পরিণত হয়েছে।

গণতন্ত্র বা জনগণের সার্বভৌমত্ব

পশ্চিমা সভ্যতার তৃতীয় পিলার হলো, জনগণের শাসন বা (sovereignty of the people)। প্রথম প্রথম রাজা এবং জায়গীরদারদের কর্তৃত্বের দুর্গ বিচুর্ণ করার জন্যে এ মূলনীতি উপস্থাপন করা হয়। বিষয়টির পরিসীমা এই পর্যন্ত যথার্থই ছিলো যে, ব্যক্তি বিশেষ অথবা গোত্র বিশেষ, কিংবা শ্রেণী বিশেষকে লক্ষ কোটি মানুষের উপর তাদের স্বেচ্ছাচারিতা চাপিয়ে দেবার এবং নিজেদের স্বার্থে তাদেরকে ব্যবহার করার অধিকার দেয়া যেতে পারে না।

দর্শনটি এই অন্যায়টিকে সমর্থন করেনা বটে, কিন্তু আরেকটি অন্যায়ের সে প্রতিষ্ঠাতা। তা হলো, এক একটি দেশ এবং এক একটি অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেরাই হবে নিজেদের সার্বভৌম শাসক ও মালিক। দর্শনটির এই অবৈধ Positive দিক উৎকর্ষিত হয়ে গণতন্ত্র এখন যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা হলো, প্রতিটি জাতি নিজের ইচছা ও মর্জির ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাদের সামষ্টিক বাসনা ও ইচ্ছাকে (কিংবা তাদের অধিকাংশের ইচ্ছাকে) কোনো জিনিসই প্রতিরোধ ও শৃংখলিত করতে পারেনা। নৈতিক চরিত্র হোক

কিংবা সমাজ, অর্থনীতি হোক কিংবা রাজনীতি, প্রতিটি ব্যাপারে সঠিক নীতি হলো তাই, যা সিদ্ধান্ত নিবে জাতীয় আকাঙ্খা।

পক্ষান্তরে ঐ সব নীতিই ভ্রান্ত, যা জাতীয় জনমত প্রত্যাখ্যান করবে। আইন জাতির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যে আইন ইচ্ছা তারা রচনা করতে পারে আর যে আইন ইচ্ছা তারা ভাংতে ও বদলাতে পারে। সরকার গঠিত হবে জাতীয় ইচ্ছা অনুযায়ী। পরিচালিত হবে জাতির ইচ্ছা অনুযায়ী এবং তার গোটা শক্তি জাতীয় ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য ব্যয় করতে হবে।

আধুনিক জীবন ব্যবস্থার এই তিনটিই হচ্ছে ভিত্তি, যা সংক্ষেপে আমি আপনাদের সামনে বর্ণনা করলাম। এগুলোর উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ধর্মহীন গণতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্র (secular democratic national state), যাকে বর্তমানে সামাজিক সংগঠনের সভ্যতম মানদণ্ড মনে করা হয়।

তিনটিই ভ্রান্ত মতবাদ

আমার মতে পশ্চিমা সমাজের এই তিনটি ভিত্তিই ভ্রান্ত। শুধু ভ্রান্তই নয়, আমি পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির সাথে এই বিশ্বাস পোষণ করি, বর্তমানে বিশ্বমানবতা যে দুর্দশায় নিমজ্জিত, তার মূল কারণ এইসব মতবাদ। আমাদের শত্রুতা মূলত এই ভ্রান্ত মতবাদগুলোর সাথে। আমরা আমাদের পূর্ণ শক্তি দিয়ে এগুলোর বিরুদ্ধে লড়তে চাই।

এই মতবাদগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ কি এবং কেন? সে প্রশ্নের জবাবের জন্যে তো দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। কিন্তু আমি কয়েকটি বাক্যে তা আপনাদের সামনে পেশ করতে চেষ্টা করবো, যাতে করে আপনারা স্পষ্টভাবে আমাদের এ লড়াইয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, বুঝতে পারেন কেন বিষয়টা এতোটা সংগীন যে, এই মতবাদগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করা অপরিহার্য!

ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীনতা (secularism) এবং তার অনিষ্ট

সবার আগে সেই ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীন জাগতিকতার কথায় আসা যাক, যা পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থার প্রথম ভিত্তি প্রস্তর। 'আল্লাহ এবং ধর্মের বিষয়টি শুধুমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পর্কিত' -এ এক সম্পূর্ণ অর্থহীন মতবাদ ও জীবন দর্শন। জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেকের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ এবং মানুষের সম্পর্কের বিষয়টি দুটি অবস্থার কোনো একটি থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারেনা। তা হলো, হয়তো আল্লাহকে মানুষ এবং এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং সার্বভৌম শাসক হিসেবে মেনে নিতে হবে, নয়তো অস্বীকার করতে হবে।

যদি শেষোক্ত অবস্থা হয়ে থাকে, অর্থাৎ আল্লাহ যদি মানুষ ও বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও সার্বভৌম কর্তা না হয়ে থাকেন, তবে তো তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখারও কোনো প্রয়োজন থাকেনা। আমাদের সাথে যার কোনো সম্পর্কই নেই, এমন সত্তার ইবাদত অর্চনা করাতো সম্পূর্ণ অর্থহীন।

আর বাস্তবিকই যদি তিনি আমাদের এবং সমগ্র বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও সার্বভৌম শাসক হয়ে থাকেন, তবে তাঁর jurisdiction কেবলমাত্র আমাদের ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হবে এবং যেখান থেকে আমাদের একজন আরেকজনের সাথে মিলিত হয়ে দুজনের সামষ্টিক জীবন শুরু হয়, সেখান থেকে তাঁর ক্ষমতাকে খতম করে দেয়া হবে, এধরনের অযৌক্তিক চিন্তার কোনো অর্থই হয়না।

এই সীমারেখা নির্ধারণ এবং ব্যক্তিগত জীবন ও সামষ্টিক জীবনের ক্ষমতার ভাগাভাগি যদি স্বয়ং আল্লাহ্ই করে থাকেন, তবে তার সপক্ষে অবশ্যি প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। আর যদি নিজেদের সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে মানুষ আল্লাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের সকল বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতা অবলম্বন করে, তবে

এটা নিজেদের স্রষ্টা, মালিক এবং সার্বভৌম কর্তার সাথে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই বিদ্রোহের সাথে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহ্ এবং তাঁর বিধানকে মানি, এরূপ দাবি কেবল এমন ব্যক্তিই করতে পারে, যার জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এর চাইতে বড় বাজে ও অর্থহীন কথা কি হতে পারে যে, এক এক ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহ্র দাস হবে, অথচ এই ব্যক্তিদাসগুলো মিলিত হয়ে যখন কোনো সমাজ সংস্থা তৈরি করবে, সেক্ষেত্রে আর তারা আল্লাহ্র দাস থাকবেনা? সবগুলো অংগ প্রত্যংগ পৃথক পৃথকভাবে দাস, অথচ সেগুলোর সমষ্টি দাসত্বমুক্ত, এ এমন এক ব্যাপার যা কেবল কোনো পাগলই চিন্তা করতে পারে!

আমাদের পারিবারিক জীবনে যে আল্লাহ্র প্রয়োজন নেই, গ্রাম ও শহর জীবনে যে আল্লাহ্র প্রয়োজন নেই, কলেজ মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে যে আল্লাহ্র প্রয়োজন নেই, হাট বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্রে যে আল্লাহ্র প্রয়োজন নেই, সংসদ ও পার্লামেন্ট ভবনে যে আল্লাহ্র প্রয়োজন নেই, কোর্ট কাচারি ও সেক্রেটারিয়েটে যে আল্লাহ্র প্রয়োজন নেই, রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর অফিসে যে আল্লাহ্র প্রয়োজন নেই, ক্যান্টনমেন্ট ও পুলিশ লাইনে যে আল্লাহ্র প্রয়োজন নেই, যুদ্ধ ও সন্ধির ক্ষেত্রে যে আল্লাহ্র প্রয়োজন নেই, অবশেষে সেই আল্লাহ্র যে আর কোন্ কাজে প্রয়োজন, সেকথা আমাদের বুঝেই আসেনা!

এমন আল্লাহ্কে কেন মানতে হবে এবং অনর্থক কেন তাঁর ইবাদত অর্চনা করতে হবে, যিনি এতোটা অকর্মন্য যে, জীবনের কোনো ব্যাপারেই আমাদের পথনির্দেশ দান করতে সক্ষম নন? নাউযুবিল্লাহ, নাকি তিনি এতোই অজ্ঞ যে, কোনো ব্যাপারেই তাঁর কোনো পথনির্দেশ আমাদের দৃষ্টিতে যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য ঠেকেনা?

এটা তো গেল এবিষয়ের যৌক্তিক দিক, বাস্তব দিক থেকে দেখলেও এর পরিণতি বিরাট ভয়াবহ। বাস্তব ব্যাপার হলো, মানুষ

যখনই জীবনের কোনো বিষয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন অবশ্যি সে বিষয়ে শয়তানের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন (private life) বলতে আসলে কোনো কিছু নেই। মানুষ মূলত একটি সমাজবদ্ধ জীব। তার পূর্ণাংগ জীবন মূলত সামাজিক জীবন।

একজন মা এবং একজন বাপের সামাজিক সম্পর্কের ফলেই তার জন্ম। জন্ম লাভের পরই একটি পরিবারে সে চোখ খোলে। জ্ঞান বুদ্ধি হবার সাথে সাথে একটি সমাজ, একটি গোত্র, একটি পাড়া, একটি জাতি, একটি সমাজ ব্যবস্থা, একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। এই যে অসংখ্য সম্পর্ক তার সাথে অন্য মানুষের এবং অন্য মানুষের সাথে তার, এগুলোর বৈধতা ও যথার্থতার উপরই ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি মানুষের এবং সামষ্টিকভাবে সকল মানুষের কল্যাণ ও সাফল্য নির্ভরশীল। আর কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো পক্ষেই মানুষকে এসব সম্পর্কের জন্যে সঠিক, সুবিচারপূর্ণ এবং স্থায়ী মূলনীতি ও সীমা নির্ধারণ করে দেয়া সম্ভব নয়।

যেখানেই মানুষ আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, সেখানে না কোনো স্থায়ী মূলনীতি অবশিষ্ট থেকেছে আর না সুবিচার ও সততা। কারণ, আল্লাহ্‌র পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হবার পর কামনা বাসনা এবং ক্রটিপূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়া এমন কোনো জিনিসই অবশিষ্ট থাকেনা, পথনির্দেশনা লাভের জন্যে মানুষ যার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীন জাগতিকতার মতবাদের ভিত্তিতে যে সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাতে মানুষের ইচ্ছা আকাংখা ও কামনা বাসনার ভিত্তিতে রোজই নতুন নতুন নীতি ও আইন তৈরি হয় এবং রোজই তা ভাংগে। আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন, আজ মানব সম্পর্কের প্রতিটি রন্ধ্রে অন্যায় অবিচার, বেঈমানি এবং পারস্পরিক আস্থাহীনতা কতোটা ব্যাপকভাবে প্রবেশ করেছে?

গোটা মানব সম্পর্কের উপর আজ ব্যক্তি, শ্রেণী, জাতি ও গোষ্ঠী স্বার্থপরতা প্রবলভাবে জেঁকে বসেছে।

দুজন লোকের সম্পর্ক থেকে নিয়ে জাতি এবং জাতির মধ্যকার সম্পর্ক পর্যন্ত এমন কোনো সম্পর্ক নেই, যেখানে আজ জিদ, হঠকারিতা ও বক্রতা স্থান করে নেয়নি। প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি সম্প্রদায়, প্রতিটি শ্রেণী, প্রতিটি জাতি এবং প্রতিটি দেশ নিজ নিজ ক্ষমতা বলয়ের মধ্যে শক্তির সীমা অনুযায়ী পূর্ণ স্বার্থপরতার সাথে আপন উদ্দেশ্য হাসিলের মূলনীতি, নিয়ম শৃংখলা ও আইন কানুন তৈরি করে নিয়েছে। এর কি প্রভাব প্রতিক্রিয়া অন্যান্য ব্যক্তি, সম্প্রদায়, শ্রেণী ও জাতির উপর পড়বে, সে পরোয়া কেউই করছেনা। পরোয়া করার মতো কেবল একটি শক্তিই রয়েছে, আর তা হলো জুতা বা ডাণ্ডা।

মোকাবেলার ক্ষেত্রে যেখানে জুতা পেটার আশংকা থাকে, কেবল সেখানেই নিজের সীমা থেকে বাইরে সম্প্রসারিত করে রাখা হাত পা কিছুটা সংকুচিত করা হয়। কিন্তু একথা সকলেরই জানা, জুতা বা ডাণ্ডা কোনো জ্ঞানী ও ন্যায়বান সত্তার নাম নয়, বরং এটা একটা অন্ধ শক্তি। আর অন্ধ শক্তি দিয়ে কখনো সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় না। যার জুতা যতো শক্তিশালী, সে অন্যদেরকে কেবল ততোটুকুই গুটিয়ে দেয়না যতোটুকু গুটানো উচিত, বরঞ্চ সে নিজের সীমা অতিক্রম করে অন্যের সীমায় পা বাড়ানোর চিন্তায় তৎপর থাকে।

অতএব ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীন জাগতিকতার সারকথা হলো এই যে, যে কেউ এই কর্মনীতি অবলম্বন করবে, সে অবশ্যি বল্গাহীন, দায়িত্বহীন ও আত্মার দাসে পরিণত হবে, চাই সে একজন ব্যক্তি হোক, একটি সম্প্রদায় হোক, একটি দেশ হোক, একটি জাতি হোক, কিংবা হোক সকল জাতি।

জাতি পূজা ও তার অনিষ্ট

এবার দ্বিতীয় মতবাদের কথায় আসা যাক। জাতীয়তাবাদ বা জাতি পূজার যে ব্যাখ্যা একটু আগে আমি আপনাদের সামনে পেশ করে এসেছি, তা যদি আপনাদের মনে তরতাজা থেকে থাকে, তবে আপনাদের নিজেদেরই বুঝতে পারার কথা, এটা বর্তমান কালে মানব জাতির উপর চেপে বসা কতো বড় অভিশাপ!

আমাদের অভিযোগ জাতীয়তার (nationality) বিরুদ্ধে নয়। কেননা জাতীয়তা একটি বাস্তব ব্যাপার। জাতীয়তার উন্নতি ও কল্যাণ চাওয়ারও বিরোধী আমরা নই, তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, অন্য কোনো জাতির অকল্যাণ চাওয়া বা করা যাবেনা। জাতীয়তার প্রতি প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই, তবে শর্ত হলো, তা গোঁড়ামি ও পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারবেনা এবং স্বজাতির স্বার্থে এতোটা অন্ধ হওয়া যাবেনা, যা অন্য জাতিকে ঘৃণা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

আমরা জাতীয় স্বাধীনতারও সমর্থক। কেননা নিজেদের সকল বিষয় নিজেদের হাতে আঞ্জাম দেয়া এবং নিজেরাই নিজেদের ঘরের ব্যবস্থা পরিচালনা করার অধিকার প্রত্যেক জাতিরই আছে। তাছাড়া এক জাতির উপর অপর জাতির শাসন বৈধ নয়।

আসলে আমাদের অভিযোগ হচ্ছে জাতীয়তাবাদের (nationalism) বিরুদ্ধে। এটা আসলে জাতীয় স্বার্থের অন্ধ পূজা ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি সমাজে যদি ঐ ব্যক্তির অস্তিত্ব অভিশাপ হয়ে থাকে, যে নিজের নফস ও ব্যক্তি স্বার্থের দাস এবং নিজের স্বার্থের জন্যে অন্ধভাবে যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত; কোনো একটি বসতিতে ঐ পরিবারটি যদি অভিশাপ হয়ে থাকে, যার সদস্যরা পারিবারিক স্বার্থের অন্ধ পূজারি এবং বৈধ অবৈধ যে কোনো উপায়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে বদ্ধপরিকর; একটি দেশে যদি ঐ শ্রেণীর লোকেরা অভিশাপ হয়ে থাকে যারা নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের

ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধ এবং অন্যদের ভালমন্দের তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থের ঘোড়া দৌড়ায়, তবে গোটা মানবমণ্ডলির মধ্যে ঐ স্বার্থপর জাতিটি কেন একটি অভিশাপ নয়, যে নিজের স্বার্থকে নিজের খোদা বানিয়ে নেয় এবং বৈধ অবৈধ যে কোনো পন্থায় সদা তার পূজা অর্চনা করে?

আমার বিশ্বাস, আপনাদের বিবেক সাক্ষ্য দেবে, সকল স্বার্থপর আত্মপূজারিদের মতো এই 'জাতীয় স্বার্থপরতা ও আত্মপূজাও' অবশ্যি একটি অভিশাপ। কিন্তু আপনারা দেখছেন, আজকের এই আধুনিক সভ্যতা বিশ্বের জাতিসমূহকে এই অভিশাপে নিমজ্জিত করে দিয়েছে এবং এরই ফলে গোটা বিশ্ব এমন সব 'জাতীয় রণক্ষেত্রে' পরিণত হয়েছে, যার প্রত্যেকটি রণক্ষেত্র অপর রণক্ষেত্রের সাথে চরম শত্রুতায় নিমজ্জিত। দুটি বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর এখনো গায়ের ঘাম শুকায়নি, অথচ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধামাডোল বাজানো হচ্ছে।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বিপর্যয়

তৃতীয় মতবাদটি প্রথম দুটির সাথে মিলিত হয়ে এই বিপত্তিকে পূর্ণাংগতা দান করেছে। একটু আগেই আমি বলে এসেছি, আধুনিক সভ্যতায় গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের শাসন বা জনগণের সার্বভৌমত্ব। অর্থাৎ একটি জনপদের লোকদের ইচ্ছা বাসনা স্বাধীনভাবে প্রয়োগ হবে, তারা আইনের অধীন হবেনা, বরং আইন তাদের ইচ্ছা বাসনার অধীন হবে। সরকারের উদ্দেশ্য হবে, তার গোটা কাঠামো এবং শক্তি জনগণের সামগ্রিক ইচ্ছা বাসনাকে পূর্ণ করার কাজে নিয়োগ করা।

এবার চিন্তা করে দেখুন, একদিকে ধর্মহীনতা (secularism) লোকগুলোকে আল্লাহ্‌র ভয় এবং নৈতিক চরিত্রের স্থায়ী নীতিমালার বন্ধন থেকে মুক্ত করে বল্গাহারা, দায়িত্বহীন এবং আত্মার দাস বানিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে জাতিপূজা (nationalism)

তাদেরকে চরমভাবে জাতীয় স্বার্থপরতা, পক্ষপাতিত্ব ও জাতীয় অহংকারের নেশায় মাতাল করে রেখেছে। আর অন্যদিকে এই গণতন্ত্র বল্গাহীন উন্মাদ আত্মার দাসদের ইচ্ছা বাসনাকে আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা দান করে এবং রাষ্ট্রের একটি মাত্র উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেয়, তা হলো তার গোটা শক্তি এমন প্রতিটি জিনিস লাভ করার জন্যে ব্যয় করবে, সমষ্টিকভাবে এই লোকেরা যার ইচ্ছা বাসনা প্রকাশ করবে।

প্রশ্ন হলো, এধরনের স্বেচ্ছাচারী স্বাধীন সার্বভৌম জাতির অবস্থা একজন ক্ষমতাধর স্বেচ্ছাচারীর চাইতে কেমন করে ভিন্ন হতে পারে? একব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী স্বাধীন ও শক্তিমান হয়ে একটি ক্ষুদ্র পরিসীমায় যা কিছু করে, এধরনের একটি জাতি তার চাইতে অনেক বড় পরিসীমায় ঠিক তাই করে থাকে। অতপর বিশ্বে যখন এধরনের জাতির সংখ্যা একটি না হয়ে বরং সমস্ত তথাকথিত সভ্য জাতি এই ধাঁচের ধর্মহীনতা, জাতিপূজা ও গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর সংগঠিত হয়, তখন বিশ্বটা নেকড়েদের সমরক্ষেত্রে পরিণত হবে না তো আর কি হবে?

এইসব কারণে এই তিনটি মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে আমরা বিনাশক ও বিপর্যয়কারী মনে করি। আমাদের শত্রুতা হলো ধর্মহীন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকরা পশ্চিমা হোক কিংবা প্রাচ্যের, অমুসলিম হোক কিংবা নামের মুসলমান, তাতে কিছুই যায় আসেনা। যেখানেই, যে দেশেই এবং যে জাতির উপরেই এ বিপদ চেপে বসবে, আমরা আল্লাহ্র বান্দাহদেরকে অবশ্যি তার ব্যাপারে সতর্ক করবো। বলবো, এই বিপদ নিজদের ঘাড় থেকে দূরে নিক্ষেপ করুন।

❖ ❖

২

ইসলামি দাওয়াতের কল্যাণময় ভিত

বিনাশশীল তিনটির পরিবর্তে বিকাশশীল তিনটি

উপরোক্ত তিনটি ভ্রান্ত নীতি ও মতবাদের প্রতিকূলে আমরা তিনটি আদর্শ মূলনীতি পেশ করছি। আমরা সমস্ত মানুষের বিবেকের কাছে আপিল করছি, আপনারা এই তিনটি মূলনীতি পরীক্ষা করে দেখুন, যাচাই পরখ করে দেখুন, আপনাদের নিজেদের কল্যাণ এবং গোটা বিশ্বের কল্যাণ এই পবিত্র মূলনীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে, নাকি ঐ বিনাশী মতবাদগুলোর মধ্যে?

আমাদের মূলনীতিগুলো হলো :

১. ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীন জাগতিকতার পরিবর্তে এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্য,

২. জাতিপূজার পরিবর্তে মানবতাবাদ,

৩. জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব।

আল্লাহ্‌র দাসত্বের অর্থ

আল্লাহ্‌র দাসত্বের মূল কথা হলো, আমরা সবাই সেই আল্লাহ্‌কে নিজেদের স্বত্বাধিকারী মনিব বলে স্বীকার করে নেবো, যিনি আমাদের এবং সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, সর্বময় মালিক ও শাসক। তাঁর থেকে মুক্ত ও মুখাপেক্ষাহীন হয়ে নয়, বরঞ্চ আমরা তাঁর বিধানের অনুগত এবং তার হিদায়াতের অনুসারী হয়ে জীবন যাপন করবো। আমরা কেবল তাঁর পূজা অর্চনাই করবোনা, বরঞ্চ তাঁর আনুগত্য এবং দাসত্বও করবো।

আমরা কেবল ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনেই কেবল তাঁর হুকুম ও হিদায়াত পালন করবোনা, বরং নিজেদের সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনেরও সকল বিভাগে তাঁর হুকুম ও হিদায়াতের অনুসারী হবো। আমাদের সমাজ, কৃষ্টি, অর্থনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন আদালত, রাষ্ট্র ও সরকার, যুদ্ধ ও সন্ধি এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াদিসহ সকল বিষয়ে সেইসব মূলনীতি ও সীমারেখার অনুসরণ করবো, যা মহান আল্লাহ আমাদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আমাদের পার্থিব বিষয়াদি ফায়সালা করার ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন নই, বরঞ্চ আমাদের স্বাধীনতা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত মূলনীতি ও সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সব মূলনীতি ও সীমা চৌহদ্দি সর্বাবস্থায় আমাদের ক্ষমতার চাইতে উচ্চতর।

মানবতার অর্থ

আমাদের দ্বিতীয় মূলনীতিটির সারকথা হলো, আল্লাহ্‌র দাসত্বের ভিত্তির উপর যে জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠে, তাতে জাতি, বংশ, দেশ, বর্ণ এবং ভাষার পার্থক্যের ভিত্তিতে কোনো প্রকার গোঁড়ামি, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি ও স্বার্থপরতার অবকাশ থাকবেনা। তা হবে জাতীয়তাবাদী সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে আদর্শিক সমাজ ব্যবস্থা। এমন প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে তার দরজা উন্মুক্ত থাকবে, যে তার মূলনীতিগুলোকে স্বীকার করে নেবে। আর যে কোনো মানুষই এর মূলনীতিগুলোকে মেনে নেবে, কোনো প্রকার বৈষম্য ও তারতম্য ছাড়াই পরিপূর্ণ সমতা ভিত্তিক অধিকারের সাথে সে এই আদর্শিক জীবন ব্যবস্থার অংশীদার হতে পারবে।

এই আদর্শিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকত্বের অধিকার (citizenship) জন্মসূত্র, বংশসূত্র কিংবা স্বাদেশিকতাসূত্রে প্রযোজ্য হবেনা, বরঞ্চ তা প্রযোজ্য হবে আদর্শিক ভিত্তিতে। যেসব লোক এই মূলনীতিগুলোর প্রতি আস্থাবান হবেনা, কিংবা কোনো কারণে

সেগুলো মেনে নিতে প্রস্তুত হবেনা, তাদেরকে উৎখাত করার, তাদের উপর নিপীড়ন চালানোর এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হবেনা, বরঞ্চ তারা নির্ধারিত অধিকার লাভ করে এই রাষ্ট্রের নিরাপত্তাধীনে (protection) থাকবে এবং সব সময় তাদের জন্যে এ সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে যে, তারা যখনই এই মূলনীতিগুলোর সত্যতা ও যথার্থতার প্রতি আশ্বস্ত হবে, তখনই সমান অধিকারের সাথে স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে এই আদর্শিক রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারবে।

এটাকেই আমরা বলছি মানবতাবাদী আদর্শ। এটা জাতীয়তাকে অস্বীকার করেনা, বরঞ্চ জাতীয়তাকে তার সঠিক ও স্বাভাবিক সীমার মধ্যে রাখতে চায়। এতে জাতীয় প্রেমের অবকাশ আছে, কিন্তু জাতীয় গোঁড়ামি পোষণ ও পক্ষপাতিত্বের কোনো স্থান নেই। জাতীয় কল্যাণ কামনা এখানে বৈধ, কিন্তু জাতীয় স্বার্থপরতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জাতীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত এবং এক জাতির উপর অপর জাতির স্বার্থগত সাম্রাজ্যবাদী থাবা ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত।

কিন্তু এমন 'জাতীয় স্বাধীনতা' কখনো গ্রহণযোগ্য নয়, যা মানবতাকে অনতিক্রমযোগ্য সীমা চৌহদ্দির মধ্যে বিভক্ত করে দেয়। মানবতাবাদের যে মূলনীতি, তার দাবিই হলো, যদিও প্রতিটি জাতি নিজ দেশের পরিচালনা নিজে করবে এবং কোনো জাতি, জাতি হিসেবে অপর জাতির তাবেদার হবে না, কিন্তু যেসব জাতি মানব কল্যাণের বুনিয়াদী নীতির ব্যাপারে ঐকমত্য হয়ে যাবে, তাদের মাঝে মানবকল্যাণ ও উন্নয়নের কাজে পূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতা থাকবে। প্রতিযোগিতার (competition) পরিবর্তে থাকবে সহযোগিতা।

তাদের মধ্যে থাকবেনা কোনো প্রকার পারস্পরিক ভেদাভেদ, বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতা। বরঞ্চ তাদের মাঝে হবে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনোপকরণের স্বাধীন বিনিময়। আর এই আদর্শ জীবন ব্যবস্থার অধীনে বসবাসকারী বিশ্বের প্রতিটি মানুষ এই গোটা আদর্শিক বিশ্বের নাগরিক হবে, যে দেশ বা জাতির মধ্যেই সে বসবাস করুক না কেন। এমনকি তারা স্বত:স্ফুর্তভাবে বলে উঠবে "প্রতিটি দেশই আমার দেশ, আল্লাহ্‌র প্রতিটি দেশ আমার স্বদেশ।"

বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতিকে আমরা একটি ঘৃণ্য পরিবেশ পরিস্থিতি মনে করি। এখানে একজন মানুষ কেবল নিজের জাতি ও দেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশ ও জাতির জন্যে বিশ্বস্ত হয়না। কোনো জাতিও এখানে নিজ জাতির লোকদের ছাড়া অপর জাতির লোকদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। একজন মানুষ নিজ দেশের বাইরে পা দিতেই অনুভব করে, আল্লাহ্‌র দুনিয়ার সর্বত্র তার জন্যে শুধু প্রতিবন্ধকতা আর প্রতিবন্ধকতা।

সর্বত্র তাকে চোর এবং পকেটমারের মতো সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়। ঘাটে ঘাটে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তল্লাশি চালানো হয়। কথাবার্তা, লেখাজোখা ও চলাফেরার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। কোথাও নেই তার জন্যে স্বাধীনতা, নেই অধিকার।

এর পরিবর্তে আমরা এমন একটি বিশ্বজনীন ব্যবস্থা চাই, যাতে আদর্শিক ঐক্যকে ভিত্তি করে জাতিসমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে ঐক্য, সমতা, ভালবাসা ও বন্ধুতা। আর এই ঐক্য ও বন্ধুতা হবে সম্পূর্ণ সমতাভিত্তিক, থাকবে common citizenship এবং স্বাধীন গমনাগমনের ব্যবস্থা।

আমাদের চোখ পৃথিবীতে আরেকবার সেই দৃশ্য দেখতে চায় যে, আজকের কোনো ইবনে বতুতা আটলান্টিকের উপকূল থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপমালা পর্যন্ত এমনভাবে ভ্রমণ করছে যে, কোথাও

তাকে বিদেশী (alien) মনে করা হয় না এবং সর্বত্রই তার জন্যে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, মন্ত্রী কিংবা দূত হবার রয়েছে পূর্ণ সুযোগ।

জনগণের খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের অর্থ

এবার তৃতীয় মূলনীতির আলোচনায় আসা যাক। আমরা জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে জনগণের প্রতিনিধিত্বের কথা বলছি। ব্যক্তির রাজত্ব (monarchy), আমিরদের কর্তৃত্ব এবং শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিশেষের ইজারাদারির আমরা ততোটাই বিরোধী, আধুনিক কালের কোনো বড় গণতন্ত্র পূজারি এগুলোর যতোটা বিরোধী। সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে সকল মানুষের সমান অধিকার, সমমর্যাদা এবং উন্মুক্ত পরিবেশের ব্যাপারে আমরাও ততোটা জোর দিয়ে থাকি, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের কোনো বড় সমর্থক যতোটা জোর দিয়ে থাকে।

আমরা একথাও সমর্থন করি যে, রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসকদের নির্বাচন দেশের সকল নাগরিকের স্বাধীন ইচ্ছা, ভোট বা রায়ের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। আমরাও এমন ব্যবস্থার চরম বিরোধী, যার অধীনে জনগণের জন্যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা সমাবেশের স্বাধীনতা এবং কাজের স্বাধীনতা থাকবে না। এমন সমাজ ব্যবস্থারও আমরা কঠোর বিরোধী, যেখানে জন্ম, বংশ ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে কিছু লোকের বিশেষ অধিকার নির্ধারিত হয়, আর কিছু লোকের জন্যে নির্ধারিত থাকে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা।

এই জিনিসগুলোই মূলত গণতন্ত্রের সারনির্যাস। এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের গণতন্ত্র ও পশ্চিমা গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

এগুলোর মধ্যে একটি জিনিসও এমন নেই, যেটা পাশ্চাত্যের লোকেরা আমাদের শিখিয়েছে। এই গণতন্ত্রকে আমরা তখন থেকেই জানি এবং বিশ্বকে এর সর্বোত্তম নমুনাও আমরা দেখিয়েছি, যখন পশ্চিমা গণতন্ত্র পূজারিদের জন্ম হতে শত শত বছর বাকি ছিলো।

আসলে পাশ্চাত্যের এই নব উদ্ভাবিত গণতন্ত্রের সাথে যে যে বিষয়ে আমাদের মতবিরোধ এবং চরম মতবিরোধ সেগুলো হলো, তারা জনগণের বল্গাহীন সার্বভৌমত্বের মূলনীতি পেশ করে, আর আমরা এটাকে তত্ত্বগত দিক থেকে ভ্রান্ত এবং পরিণতির দিক থেকে ধ্বংসাত্মক মনে করি।

প্রকৃত কথা হলো, সার্বভৌমত্বের (sovereignty) অধিকারী তো কেবল তিনিই হতে পারেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, প্রতিপালন করছেন এবং বড় হবার ও বৃদ্ধি লাভের উপকরণ সরবরাহ করছেন। যার আশ্রয়ে তাদের এবং সমগ্র বিশ্বের সত্তা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং যার অলংঘনীয় বিধানের অধীন বিশ্ব জগতের প্রতিটি জিনিস বন্দি।

তাঁর বাস্তব ও কার্যকর সার্বভৌমত্বের মধ্যে যে সার্বভৌমত্বেরই দাবি করা হোক না কেন, চাই তা কোনো একজন ব্যক্তির ও পরিবারের রাজত্ব হোক, কিংবা হোক কোনো জাতি বা তার জনগণের, সর্বাবস্থায় তা একটি ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই ভ্রান্তির আঘাত বিশ্ব জগতের প্রকৃত সম্রাটের প্রতি নয়, বরঞ্চ সেই আহাম্মক দাবিদারের প্রতিই পতিত হবে, যে নিজেই নিজের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি।

প্রকৃত ব্যাপার যখন এই, তখন সঠিক কথা হলো এবং পরিণতির দিক থেকে এই কথার মধ্যেই রয়েছে মানুষের কল্যাণ নিহিত যে, আল্লাহ্ তায়ালাকে সার্বভৌম অধিকর্তা স্বীকার করে নিয়ে মানুষ তার রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দৃষ্টিভংগিতে গড়ে তুলবে। এই খেলাফত অবশ্যি গণতান্ত্রিক হতে হবে। জনগণের ভোট বা রায়ের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের আমির বা প্রধান নির্বাহী নির্বাচিত হতে হবে। তাদের রায়ের ভিত্তিতেই শূরা (সংসদ) সদস্যদের নির্বাচিত হতে হবে। তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সমগ্র

ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হতে হবে। সমালোচনার পূর্ণ ও প্রকাশ্য অধিকার তাদের থাকতে হবে।

কিন্তু এইসব কিছুর ক্ষেত্রে যে অনুভূতি ও চেতনা বিদ্যমান থাকতে হবে তা হলো, রাজ্য আল্লাহ্‌র। আমরা মালিক নই বরং প্রতিনিধি এবং আমাদের প্রত্যেকটি কাজের জন্যে আসল মালিকের কাছে হিসাব দিতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে।

তাছাড়া সেইসব নৈতিক নীতিমালা এবং আইনগত বিধান ও সীমারেখা নিজ নিজ স্থানে অটল ও কার্যকর থাকতে হবে, যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জীবন পরিচালনার জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমাদের পার্লামেন্টের বুনিয়াদি দৃষ্টিভংগি হবেঃ

১. যেসব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিধান ও পথনির্দেশ দিয়েছেন, সেসব বিষয়ে আমরা আইন প্রণয়ন করবোনা। বরং প্রয়োজন অনুযায়ী আল্লাহর বিধান ও পথনির্দেশের আলোকে ব্যাখ্যামূলক আইন গ্রহণ করবো।

২. আর যেসব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কোনো বিধান বা পথনির্দেশ প্রদান করেননি, আমরা মনে করবো, সেসব ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। তাই কেবল এসব বিষয়েই আমরা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করবো।

কিন্তু এসব আইনকে অবশ্যি সেই সামগ্রিক কাঠামোর স্পীরিট ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে, যা আল্লাহ্‌র দেয়া মূলনীতি ও পথনির্দেশনা আমাদের জন্যে তৈরি করে দিয়েছে।

অতপর এই গোটা আদর্শিক ব্যবস্থার পরিচালনা ও এর রাজনৈতিক কর্তৃত্বভার এমন সব লোকদের উপর ন্যস্ত হওয়া আবশ্যক, যারা আল্লাভীরু, আল্লাহ্‌র আনুগত্যকারী এবং প্রতিটি

কাজে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আকাংখী। যাদের জিন্দেগি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হবার এবং জবাবদিহি করবার ব্যাপারে একীন রাখে। যাদের পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় জীবন থেকেই এ সাক্ষ্য পাওয়া যাবে যে, তারা বল্গাহীন ঘোড়ার মতো নয়, যে ঘোড়া প্রতিটি জমিতে চরে বেড়ায় এবং প্রতিটি সীমাকে লংঘন করে নির্বিচারে।

বরঞ্চ তারা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এক অলংঘনীয় নিয়মনীতি ও বিধি বিধানের রজ্জুতে বাঁধা এবং এক আল্লাহ্‌র দাসত্বের খুঁটির সাথে সে রজ্জু মজবুতভাবে গাঁথা। আর তাদের সমগ্র কর্মকান্ড সেই চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যতোটা ঐ রজ্জু তাদেরকে যেতে দেয়।

বন্ধুগণ! এই হচ্ছে সেই তিনটি মূলনীতি, এতোক্ষণ সংক্ষেপে যেগুলোর ব্যাখ্যা আমি আপনাদের সামনে পেশ করলাম। আধুনিক কালের জাতিপূজারি ধর্মহীন গণতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে আমরা এক আল্লাহ্‌র দাসত্বের ভিত্তিতে মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আর এই খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

আপনারা এক দৃষ্টিতেই অনুধাবন করতে পারেন, এই দুইটি ব্যবস্থার মধ্যে কি ও কতোটা পার্থক্য রয়েছে। এখন এদুটির মধ্যে কোন্‌টি উত্তম, কোন্‌টিতে আপনাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে, কোনটি প্রতিষ্ঠা করতে আপনারা আগ্রহী এবং কোনটি প্রতিষ্ঠা করতে ও প্রতিষ্ঠিত রাখতে আপনারা আপনাদের শক্তি সামর্থ নিয়োগ করতে চান, তার ফয়সালা করা আপনাদের বিবেকের উপর নির্ভর করছে।

❖ ❖

ইসলামি দাওয়াতের গতিধারা

ইসলামের দাওয়াত গোটা মানবজাতির জন্যে

ইসলাম জন্মসূত্রের মুসলমানদের পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। বরঞ্চ আল্লাহর এ অনুগ্রহ তিনি গোটা বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির জন্যে পাঠিয়েছেন। এ হিসেবে কেবল মুসলমানদেরই নয়, বরং গোটা মানবজাতির জীবনকে সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্যের এই ব্যাপকতা স্বাভাবিকভাবেই দাবি করে, আমাদের আহ্বান যেন হয় সার্বজনীন এবং কোনো বিশেষ জাতির স্বার্থকে সামনে রেখে যেন আমরা এমন কোনো কর্মপন্থা অবলম্বন না করি, যা ইসলামের এই সার্বজনীন আহবানকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, কিংবা মূল উদ্দেশ্যের সাথে হবে সাংঘর্ষিক।

মুসলমানদের প্রতি আমাদের আকর্ষণ একারণে নয় যে, আমরা তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছি কিংবা তারা আমাদের জাতির লোক। বরঞ্চ তাদের প্রতি আমাদের আকর্ষণের কারণ কেবল এটাই যে, তারা ইসলামকে মানে। তারা পৃথিবীতে নিজেদের ইসলামের প্রতিনিধি মনে করে। গোটা মানবজাতির কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছানোর জন্যে তাদেরকেই মাধ্যম বানানো যেতে পারে।

পূর্ব থেকে যারা মুসলমান, তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামের সঠিক নমুনা পেশ করা ছাড়া অন্যদের নিকট ইসলামের আহ্বান আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতে সবসময় ঐ সমস্ত লোকদের পথ থেকে আমাদের পথ পৃথক, মুসলমানদের প্রতি যাদের আকর্ষণের মূল কারণ হলো, তারা তাদেরই জাতির লোক। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রতি তাদের

কোনো আকর্ষণ নেই, কিংবা থাকলেও একারণে যে, এটা তাদের জাতির ধর্ম।

ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ

আমরা একদিকে সাধারণভাবে সকল মানুষের কাছে সেই মহান উদ্দেশ্যের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছি। অপর দিকে যারা পূর্ব থেকেই মুসলমান, তাদেরকে আমরা জ্ঞান ও চরিত্রের দিক থেকে ইসলামের যথার্থ নমুনা পেশ করার জন্যে তৈরি করছি।

আমরা কখনো ইসলাম এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের পার্থক্যকে চোখের আড়াল হতে দেইনা। ইসলামের আদর্শ, বিধিমালা এবং ইসলামি দাওয়াতের স্বার্থকে আমরা সবসময় জাতি এবং জাতীয় স্বার্থের উপর অগ্রাধিকার দেই। যেখানেই এদুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে এক মুহূর্তের জন্যেও ইসলামের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে আমরা দ্বিধা সংকোচ করিনি। আমরা মুসলমানদের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্যে চেষ্টা করে থাকলে, তা এজন্যে করিনি যে, অন্যান্য জাতির মতো এ জাতিটিরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় থাকুক, বরঞ্চ তা কেবল এ জন্যেই করেছি, পৃথিবীতে যেন সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে জাতিটি বেঁচে থাকে।

আমরা একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যদি চেয়ে থাকি, তবে তা এজন্যে চাইনি যে, একটি সেকুল্যার রাষ্ট্রের জন্ম হোক। বরঞ্চ কেবল এ উদ্দেশ্যেই চেয়েছিলাম, যেন একটি নিরেট ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পৃথিবীর সামনে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ নমুনা উপস্থাপন করবে।

ঐ সমস্ত লোকদের পক্ষে কখনো আমাদের এই অবস্থানকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, যারা ইসলাম এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদকে একাকার করে ফেলেছে। কিংবা জাতিকে দীনের

উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। অথবা, দীনের পরিবর্তে কেবল জাতির ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

আমাদের আর তাদের পথ কখনো যদি কোনো স্থানে এসে একত্র হয়েও থাকে, তবে তা নিতান্তই সাময়িকভাবে হয়েছে এবং ঐ স্থানেই হয়েছে, যেখানে ঘটনাচক্রে ইসলাম আমাদেরকে ও তাদেরকে একত্র করে দিয়েছে। তা না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের এবং তাদের চিন্তা পদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতিতে বৈপরিত্য ও পার্থক্যই বর্তমান।

আমরা কেবল আল্লাহ এবং রসূলের জন্যেই এই অধিকার মনে করি যে, কেবল তাঁদের কাছেই আমাদেরকে বিশ্বস্ত হতে হবে। এরপর আমাদেরকে ঐ সমস্ত লোকদের কাছে বিশ্বস্ত হতে হবে, যারা আল্লাহ এবং রসূলের বাধ্যগত ও বিশ্বস্ত। এই বিশ্বস্ততা থেকে বিচ্যুত হওয়াকে আমরা অবশ্যি আমাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালের অভিশাপ মনে করি। এই বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে যদি আমরা অটল অবিচল থাকি, তবে আমাদের প্রতি যতো দোষারোপই করা হোক না কেন, সেটা আমাদের জন্যে লজ্জার বিষয় নয়, বরং গর্বের বিষয়।

দীন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভংগি

দীন-এর যে ধারনা আমরা পোষণ করি, সেক্ষেত্রেও আমাদের এবং অন্য কিছু লোকের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আমরা 'দীন'কে কেবল পূজা পার্বণ এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি ধর্মীয় বিশ্বাস ও রসম রেওয়াজের সমষ্টি মনে করিনা। বরঞ্চ আমাদের মতে, 'দীন' শব্দটি জীবন পদ্ধতি ও জীবন ব্যবস্থার সমার্থক। এই দীন মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত।

কারণ, মানব জীবনের বিভিন্ন দিক মানব দেহের বিভিন্ন অংশের মতোই একটি অপরটি থেকে স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও

পরস্পর এমনভাবে সংযুক্ত হয়ে যে, সবগুলো মিলিত হয়ে একটি এককে পরিণত হয়ে আছে এবং একটি প্রাণই তাদেরকে জীবিত রাখে ও পরিচালিত করে। এই প্রাণ যদি আল্লাহ্ এবং পরকাল থেকে বিমুখ এবং নবীগণের শিক্ষা থেকে সম্পর্কহীন প্রাণ হয়, তবে জীবনের গোটা কাঠামোই একটি ভ্রান্ত দীনে পরিণত হয়ে যায়। এর সাথে যদি খোদামুখী ধর্মের সংযোগ রাখাও হয়, তবে গোটা কাঠামোর প্রকৃতি ক্রমান্বয়ে সেটাকে গ্রাস করে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত সেটা সম্পূর্ণরূপে দীন থেকে খালি হয়ে যায়।

আর এই প্রাণ যদি আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি ঈমান এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসরণ ও অনুবর্তণের প্রাণ হয়, তবে তার দ্বারা গোটা জীবন কাঠামো একটি সত্য দীনে পরিণত হয়ে যায়। তার কার্যপরিধির মধ্যে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কোনো ফিতনা কোথাও যদি থেকেও যায়, তবে তা সহসা মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে পারেনা।

এ কারণেই আমরা যখন দীন প্রতিষ্ঠার কথা বলি, তখন তার অর্থ কেবল মাত্র মসজিদে দীন কায়েম করা, কিংবা কয়েকটি ধর্মীয় আকিদা বিশ্বাস ও নৈতিক বিধান প্রচার করাই আমরা বুঝাইনা। বরঞ্চ, আমাদের কাছে এর অর্থ হলো, ঘরবাড়ি, মসজিদ, মাদ্রাসা, কলেজ ইউনিভার্সিটি, হাট বাজার, থানা, সেনানিবাস, কোর্ট কাচারি, সংসদ, মন্ত্রীসভা, দূতাবাস, সর্বত্রই সেই এক আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাকে আমরা আমাদের প্রভু এবং মা'বুদ বলে মেনে নিয়েছি।

আর এসব কিছুর ব্যবস্থাপনা সেই রসূল সা.-এর শিক্ষানুযায়ী পরিচালিত করতে হবে, যাকে আমরা আমাদের প্রকৃত পথ প্রদর্শক বলে স্বীকার করে নিয়েছি। আমরা যদি মুসলমান হয়ে থাকি, তবে আমাদের প্রত্যেকটি জিনিসকেই মুসলমান হতে হবে। আমাদের

জীবনের কোনো একটি দিক ও বিভাগকে আমরা শয়তানের হাতে সমর্পণ করতে পারিনা। আমাদের সবকিছুর মালিক এক আল্লাহ্। এতে শয়তান বা কাইজারের কোনো অংশ নেই।

আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

আমাদের এসব বক্তব্যে কিছু লোক অসন্তুষ্ট হয়। এরা হলো তারা, যারা ধর্মের একটি সীমাবদ্ধ ধারণা নিজেদের মনে বদ্ধমূল করে নিয়েছে। এরা দীন ও দুনিয়া এবং ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক পৃথক জিনিস মনে করে। তাদের মতে এগুলোর একটির সাথে অপরটির কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের মতে, মানুষের জীবন আল্লাহ্ এবং কাইজারের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হতে পারে এবং হওয়া উচিত। তারা মনে করে, খোদাভক্তির ধর্ম, খোদাহীন সভ্যতা ও ধর্মহীন রাজনীতির সাথে জীবনের বিভক্তি গ্রহণ করা যেতে পারে এবং মসজিদ আর খানকা নিজের হাতে রেখে বাকি সবকিছু শত্রুর হাতে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।

আমাদের সম্পর্কে এরা বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপন করেঃ

ধর্ম ও রাজনীতি

তাদের কেউ বলেঃ 'তোমরা ধর্ম প্রচার করো, কিন্তু আবার রাজনীতিতে অংশ নেও কেন?' আমরা বলিঃ

"দীন যদি কর জুদা রাজনীতি রেখে
তবে তো কেবল চেংগিজিই যায় থেকে।"

তবে কি তারা এটাই চান যে, আমাদের রাজনীতিতে চেংগিজি জেঁকে বসে থাকুক আর আমরা মসজিদে বসে ধর্ম প্রচার করতে থাকি?

আসলে তারা আমাদেরকে কোন্ ধর্মটি প্রচার করার কথা বলছেন? সেটা যদি পাদ্রীদের ধর্ম হয়ে থাকে, রাজনীতিতে যার

প্রবেশাধিকার নেই, তবে আমরা সে ধর্মের প্রতি ঈমান রাখিনা। আর সেটা যদি কুরআন ও হাদিসের ধর্ম হয়ে থাকে, যার প্রতি আমরা ঈমান রাখি, তবে তা রাজনীতিতে কেবল প্রবেশাধিকারই দেয়না, বরঞ্চ রাজনীতিকে নিজের একটি অপরিহার্য অংগ বানিয়ে রাখতে চায়।

কেউ বলেনঃ 'তোমরা প্রথমত ধর্মীয় লোকই ছিলে, কিন্তু এখন রাজনৈতিক গোষ্ঠী হয়ে গেছো।' অথচ আমাদের অবস্থা তাদের এই অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আমরা এমন একটি দিনও অতিবাহিত করিনি যখন আমরা অরাজনৈতিক ধর্ম অনুযায়ী 'ধর্মীয়' ছিলাম আর এখন ধর্মহীন রাজনীতি অনুযায়ী 'রাজনৈতিক' হয়ে গেছি। আমরা তো কেবল ইসলামের অনুসারী এবং কেবলমাত্র ইসলামকেই প্রতিষ্ঠা করতে চাই। ইসলাম যতোটা 'ধর্মীয়' আমরা ততোটাই 'ধর্মীয়' আছি এবং প্রথমদিন থেকেই ছিলাম। আর ইসলাম যতোটা 'রাজনৈতিক' আমরাও প্রথমদিন থেকে কেবল ততোটাই 'রাজনৈতিক' ছিলাম। ধর্ম ও রাজনীতির ব্যাপারে আপনাদের গুরু হচ্ছে ইউরোপ। একারণে আপনারা ইসলামকেও বুঝতে পারেননি, আর আমাদেরকেও।

কারো কারো অভিযোগ হচ্ছেঃ খোদা তো কেবল উপাস্য মা'বুদ। তোমরা কেমন করে তাঁর জন্যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রমাণ করছো? তোমাদের প্রতি অভিশাপ, তোমরা মানুষের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে, সে কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করছো।

কিন্তু আমরা মনে করি, কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আল্লাহ কেবল উপাস্যই নন। বরঞ্চ, আনুগত্য ও দাসত্ব লাভের অধিকারও কেবলমাত্র তাঁরই। এর মধ্যে যে কোনো অধিকারের ক্ষেত্রেই আল্লাহর সাথে অন্যদের শরিক করা হোকনা কেন, তা হবে শিরক। কোনো বান্দার আনুগত্য যদি করা যেতে পারে, তবে

কেবল আল্লাহর শরয়ী অনুমতির ভিত্তিতেই করা যেতে পারে আর তাও কেবল আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমার ভেতর।

আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে, স্বাধীন আনুগত্যের দাবিদার হবার অধিকার তো রসূল সা.-এরও নেই। সেক্ষেত্রে কোনো মানবরাষ্ট্র কিংবা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার অধিকারের তো প্রশ্নই উঠেনা। যে আইন আদালত ও রাষ্ট্রে আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাহকে চুড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী (final authority) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়না, সেসবের বৈধ হবারই কোনো প্রমাণ ইসলামে নেই। এ বিপত্তিকে খুব বেশি হলে ঐ অবস্থায় কেবলমাত্র বরদাশত করা যেতে পারে, যখন মানুষ তার ক্ষমতার খপ্পরে বন্দি হয়ে পড়ে।

কিন্তু, যে ব্যক্তি এধরনের রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তৃত্বের অধিকার স্বীকার করে নেবে এবং 'খোদায়ী নির্দেশাবলি পরিত্যাগ করে, মানুষ নিজেই নিজের সমাজ, কৃষ্টি রাজনীতি ও অর্থনীতির মূলনীতি ও আইন কানুন প্রণয়নের বৈধ কর্তৃপক্ষ' একথাকে একটি সঠিক মূলনীতি হিসেবে স্বীকার করে নেবে সে ব্যক্তি যদি আল্লাহকে স্বীকার করে, তবে সে অবশ্যি শিরকে নিমজ্জিত।

ইসলামি রাষ্ট্র

এমন কিছু লোক আছে, যারা বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে: 'এই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কোন্ নবীর দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিলো? কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করছি, এই যে কুরআনে এবং তাওরাতে আকিদা ও ইবাদতের সাথে সাথে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন, যুদ্ধ ও সন্ধির বিধান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়ম কানুন এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো কি শাস্ত্র চর্চার জন্যেই আলোচিত হয়েছে? কিতাবুল্লাহর শিক্ষার যে অংশ আপনার ইচ্ছা মানবেন আর যে অংশ ইচ্ছা অপ্রয়োজনীয় সামগ্রির

মধ্যে গণ্য করবেন, একাজটি কি আপনার ইচ্ছার স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে?

পূর্ববর্তী নবীগণ আ. এবং আখেরি নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটা কি তাদের নবুয়্যতি মিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা? তাঁরা কি কেবল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিজেদের রাজত্বের আকাংখা পূর্ণ করেছিলেন? পৃথিবীতে কি কেবল পঠন পাঠনের উদ্দেশ্যে কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়, যেটাকে বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার কোনো উদ্দেশ্য থাকে না?

আমরা প্রতিদিন নামাযে আল্লাহর কিতাবের সেইসব আয়াত পাঠ করবো যেগুলোতে জীবনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে মূলনীতি ও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে আর রাতদিন আমাদের জীবনের অধিকাংশ কাজ কারবার পরিচালিত করবো, সেগুলোর বিপক্ষে ঈমান কি সত্যিই এই জিনিসের নাম?

সমাপ্ত